মাতৃপ্রসঙ্গ

বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও শ্রীশ্রীমা

কুমকুম সমাদ্দার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন, এর নাম জ্ঞান। বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সহিত আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

''কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে; এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান।''[১]

ঠাকুর এখানে বলছেন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা। অধ্যাত্মজগতের বিপুল বিজ্ঞানাগারে বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ নিয়ে চলেছিল তাঁর সুদীর্ঘ সাধনা। সাধনপথের প্রান্তে বারবার তিনি একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। দেখেছেন একই পুকুরের জলের বিভিন্ন ঘাটে বিভিন্ন নাম। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জেনেছেন তিনি। হয়েছেন বিজ্ঞানী। তাঁর সব experiment-এর inference হল 'যত মত তত পথ'।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে সাধারণ অর্থে বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি জড়বিজ্ঞান বা science—যার আভিধানিক অর্থ নিয়মিত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা কোনও বিষয়ে প্রমাণযুক্ত লব্ধ জ্ঞান। আধুনিক বিজ্ঞান, তার প্রয়োগ ও প্রযুক্তির ব্যবহার এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে আমরা একটি পা-ও চলতে পারব না। আজ থেকে প্রায় শতাধিক বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার ব্যবহারের ওপর বারবার জোর দিয়েছেন। বলেছেন, ''...যথার্থ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে আমরা তাহাদের (পাশ্চাত্যজাতির) নিকট ঐহিক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হইব।''[২] আর এক জায়গায় বলছেন, ''একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষগুণ বিচার) করতে যাস—আহাম্মক্! ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে।''[৩] স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ছিল—''পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্রগঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।''[৪] অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন সর্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষা এবং ছোটো-বড়ো সকল কাজ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা।

এবার আসা যাক শ্রীশ্রীমায়ের কথায়। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছরেরও আগে বাংলার অজ পাড়াগাঁয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের মা। সেখানে ম্যালেরিয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ। কঙ্কালসার গরুগুলোর বাঁটে কয়েক ছটাকের বেশি দুধ পাওয়া যায় না। ভালো আনাজপাতির দরকার পড়লে ভিনগাঁয়ে যেতে হয়। মায়ের লেখাপড়া ''বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগটি শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনের 'ঐক্য, মাণিক্য ও কুবাক্য' পর্যন্ত।''[৫] মা পড়তে পারেন। রামায়ণ পাঠ করেন। কিন্তু লিখতে পারেন না। এরকম পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মায়ের বাল্য, কৈশোর ও উত্তরজীবনের অনেকাংশই কেটে গেছে।

এসব সত্ত্বেও গৃহস্থালির অনেক কাজকর্মে দেখা গেছে মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আশ্চর্যরকম বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জীবনযাত্রার গোড়ার কথাই হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। আজ থেকে শতাধিক বর্ষ পূর্বে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা hygiene সম্পর্কে পল্লিগ্রামের মেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের সচেতনতার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সিলেট জেলার শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। বারো বছর ধরে হাতের দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। সংকোচে মায়ের সামনে হাতও বার করেন না কিন্তু মায়ের দৃষ্টিকে সন্তান কতদিন ফাঁকি দেবে? একদিন তা মায়ের নজরে পড়ে যায়। সন্তানের এরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি দেখে মা ব্যথিত হন এবং মায়ের কৃপায় ঠাকুরের চরণামৃত প্রয়োগে ক্ষীরোদ ব্যাধিমুক্ত হন। মা কিন্তু ক্ষীরোদের হাতে এরূপ কঠিন ব্যাধির সংক্রমণের কারণটি ধরে ফেলেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করছেন, ''যেদিন পেঁপে কেটেছিলে সেদিন কি খেউরি করেছিলে?'' তিনি মনে নেই বলায় মা বললেন, ''খেউরিও করেছিলে এবং পেঁপের কষও লেগেছে। দুটোতে মিলেই ঐ সব হয়েছে।'' সেদিন বিকেলে উপস্থিত মেয়েদের মা বলছেন, ''ওগো, তোমাদের সকলকেই বলছি, তোমাদের স্বামী, পুত্র এবং তোমরা নিজেরাও নাপিতের নরুন দিয়ে নখ কেটো না। এতে অনেক খারাপ রোগ হতে পারে। এইতো বৌমার হাতে এরূপ হয়েছে। অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায় এ থাকবে না।''

ক্ষীরোদবালা লিখছেন, ''সেদিন একসঙ্গে বসে খাওয়া, এক বিছানায় দুজন শোয়া, একজনের কাপড়-গামছা অপরের ব্যবহার করার কত দোষ, কিভাবে একজনের দেহের ভাল বা মন্দ অন্যের দেহে যায় এইসব বলিলেন।''[৬]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, 'নাপিতের নরুন' যে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ বা infection-এর উৎস সে সম্পর্কে মা সকলকে সচেতন করেছেন। অথচ আজ এত বছর পরও গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাপিত দিয়ে নখ কাটানোর (বিশেষ করে কোনও অশৌচান্তে) রীতি প্রচলিত আছে। শ্রীশ্রীমা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল নিয়মগুলিও মেয়েদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জানিয়ে দিচ্ছেন একত্র খাওয়া, শোয়া এবং একই কাপড়-গামছা একাধিক জনের ব্যবহারের ফলে কীভাবে একের অসুখ অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে। স্বল্পমাত্র লেখাপড়া জানা শ্রীশ্রীমায়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ডিগ্রিধারী মানুষের আচরণে লক্ষ করা যায় না।

একদিন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ খাবার জন্য শালপাতায় একটু জল ছিটিয়ে ঝেড়ে পাতছেন, দেখে মা বললেন, ''আহা! ছেলেরা খাবে, ভালো করে ধুয়ে নাও। নইলে ধুলো থাকবে। আমার যখন শক্তি ছিল তখন আমি এক একটি পাতা ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছতাম।''[৭] অস্বাস্থ্যকর ধুলোমাখা পাতায় মা কেমন করে ছেলেদের খেতে দেবেন! কোনও ছেলের হাতের কাজ সেরে খেতে আসতে দেরি হচ্ছে, ''মা পাতা আগলে বসে আঁচল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন।''[৮] মাছি-বসা দূষিত খাবার যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত হানিকর তা মায়ের থেকে আর কে বেশি জানে!

১৩১৯ সাল। মা কাশীধামে আছেন। স্বামী শান্তানন্দ প্রতিদিন অদ্বৈত আশ্রম থেকে পূজার ফুল এবং ঠাকুরের মিষ্টি ইত্যাদি এনে দিতেন। তাঁর কথায়, ''একদিন জিলাপি লইয়া যাইবার সময় বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় খাবারের উপর চিলে ছোঁ মারিল, সাথে সাথে ২/১ খানা জিলাপিও লইয়া গেল। আমি বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম; আসিয়া মাকে সমস্ত বিবৃত করিলে মা সেই জিলাপিগুলি ঠাকুরের ভোগে তো দিলেনই না। এমনকি আমাদের কাহাকেও খাইতে দিলেন না, বলিলেন, 'চিলের পায়ে কত কি থাকে, এ তোমাদের খেয়ে দরকার নেই।' শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদের কি চোখেই না দেখিতেন!''[৯] হয়তো আপাতদৃষ্টিতে বাকি জিলিপিগুলি দেখতে পরিষ্কারই ছিল কিন্তু চিলের নোংরা পা থেকে কিছু যদি তাতে লেগে গিয়ে থাকে, সাদা চোখে তা বুঝতে পারার কথা নয়। মা কিন্তু সন্তানদের খাবারের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে একটুও ঢিলেমি দিতে রাজি নন। পাছে অপরিচ্ছন্ন দূষিত খাদ্য গ্রহণে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন, সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষার

ব্যাপারে সদা সজাগদৃষ্টিসম্পন্না মায়ের মুখে নিষেধাজ্ঞা শোনা গেল—''এ তোমাদের খেয়ে দরকার নেই।''

আর একটি ঘটনা। একবার শ্রীশ্রীমা চলেছেন জয়রামবাটী। সকাল নটা। হাওড়া স্টেশনে তাঁর ট্রেনটি তখনও ছাড়েনি। ওই একই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ যাবেন ভুবনেশ্বর। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে মহারাজ কিন্তু তাঁর গাড়িতে উঠলেন না। পাশের প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনে মা বসে আছেন, হাতজোড় করে সেইদিকে হেঁটে চলেছেন। মায়ের কামরার সামনে পৌঁছে প্ল্যাটফর্মেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বললেন, ''মা আমি ভুবনেশ্বর যাচ্ছি। আপনাকে একবার ওখানকার মঠে পায়ের ধুলো দিতে হবে।'' মা ঘোমটার ভেতর থেকে সম্মতি জানালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, ''সাবধানে যেও, বাবা। শুনেছি ওখানে বড় ম্যালেরিয়া। সাবধানে থেকো, জল ফুটিয়ে খেও।''[১০] ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত ভুবনেশ্বরে চলেছেন মানসপুত্র রাখাল। মায়ের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ছেলে যাতে সুস্থ থাকে, পানীয় জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে পান করার নির্দেশ দিচ্ছেন মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।'' মনই আমাদের সকল চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সকল কর্মে প্রবৃত্ত করে তা ভালোই হোক বা মন্দই হোক। সদাচঞ্চল মনের গতিপথ বড়ো বিচিত্র! মা তাই বলছেন, ''মন না মত্ত হস্তী মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়।'' মনকে সঠিক পথে চালনা করবার চেষ্টা করতে হয়। সুস্থ সমাজ গঠন করতে হলে প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠনও সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। আর এটি করতে অনেকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় মনঃসমীক্ষণ বা psycho-analysis। এই মনোবিশ্লেষণতত্ত্বকে আধুনিক জগতে বলা হয় মনোবিজ্ঞান যা আধুনিক বিজ্ঞানভাবনার একটি প্রধান শাখা। প্রগতিশীল দেশগুলিতে মনোবিজ্ঞান নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণা ও তার সফল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

গ্রামের মেয়ে শ্রীশ্রীমা কোনওদিন তথাকথিত psychology বা কেতাবি মনোবিজ্ঞানের পাঠ নেননি, কিন্তু সকলের মনোজগতে অন্তর্যামিনী মায়ের ছিল অবাধ বিচরণ। মায়ের সংসারটি ছিল বড়ো বিচিত্র! অবুঝ খেয়ালি রাধু, পাগল ছোটোবউ সুরবালা, বিষয়লোভী ভাইয়েরা, শুচিবায়ুগ্রস্ত কলহপরায়ণ ভাইঝি নলিনী—এদের নিয়েই মায়ের সংসার। এছাড়া সাধু, ব্রহ্মচারী, দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তের দল, পাড়া-প্রতিবেশী, দরিদ্র গ্রামবাসী, চোর-ডাকাত, 'ভিকিরী-বোষ্টম' সকলেই আছেন মায়ের বিপুল সংসারে। মা সবাইকে নিয়ে চলেন। সবার মন বুঝে চলেন। মায়ের কর্মধারা 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।'

মায়ের সংসারে রাধুর পোষা বেড়ালটিও স্নেহ-আদরে লালিত। জ্ঞান মহারাজ বেড়ালগুলোকে পছন্দ করেন না। এদিকে মা কলকাতা যাবেন। জ্ঞান মহারাজকে ডেকে মা বললেন, ''জ্ঞান, বেড়ালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা।'' কথাগুলো বলেও মা নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এবারে মা যে কথাটি বললেন সেটি শোনার পর জ্ঞান মহারাজ বেড়ালগুলোকে মারা তো দূরস্থান, উলটে রোজ চুনো মাছ ভেজে ভাতের সঙ্গে মেখে ওদের খেতে দিতেন। মা বলেছিলেন, ''দেখ, জ্ঞান, বেড়ালগুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।''[১১]

স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' বইটিতে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ আছে যার শিরোনাম—'লোকের মন রেখে চলা'। পরিচ্ছেদটি পড়লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় মানুষের মনস্তত্ত্ব বা Human-psychology সম্পর্কে মায়ের উপলব্ধি কতদূর বাস্তব ও গভীর ছিল। কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষের কথা শুনে মা বলছেন, ''সে কি গো! অত হুকুম চালালে কি করে আশ্রম চলবে? হলেই বা ছেলেরা সব তার ছাত্র। নিজের ছেলেকেই একটু বেশী কষলে শেষে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যা কিছু করো না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান্যি দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য করতে হয়, যাতে বেশী কিছু খারাপ না হয়।''[১২]

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীদ্বয় Kenneth Thomas এবং Ralph Kilmann কর্তৃক ১৯৭০ সালে প্রকাশিত থিয়োরি থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে দেখা

যাবে শ্রীশ্রীমায়ের কথার সঙ্গে তাঁদের সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে :

''Managed in the wrong way, differences between people can quickly spiral out of control, resulting in situations where co-operation breaks down and the team's mission is threatened.... It helps to take a positive approach to conflict resolution, where discussion is courteous."

'লোকের মন রেখে চলা' প্রসঙ্গে মা বলছেন, ''আমি এই যে রাধুর ঘরে তত্ত্ব পাঠাবো, তা নলিনীর সঙ্গেও পরামর্শ করি। নলিনী ও ছোট বৌতে সাপে-নেউলে। এ ওর ভালো দেখতে পারে না, আর সে ওর ছায়া দেখতে পারে না! কিন্তু আমি যখন নলিনীকেই মুরুব্বি করে তার পরামর্শ চাই আর বলি—'দেখ্ নলিনী, তোদের কি পছন্দ এ সব দেখে শুনে আমায় বল্।' আমি যা জিনিসের ফর্দ বলি, নলিনী তখন তাতে বলে, 'ওতে কি করে হবে পিসীমা, ওরা যেমনই ব্যবহার করুক? আর রাধীটা তো একটা পাগল—জ্ঞানগম্যি কিছুই নেই। কিন্তু পিসীমা, তোমার তো একটা মর্যাদা আছে! তুমি অত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন? তুমি তোমার মতো করে দাও।' এই বলে নলিনী আরও জিনিসের ফর্দ বাড়ায়। আমি তো মনে মনে হাসি। এটুকু যদি ওকে না জানিয়ে গোপনে পাঠাই, তাহলে অমনি দু-জনে তাই নিয়ে ধুমধাড়াক্কা কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে। দেখো, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।"[১৩]

সংসারে সকলকে কিছুটা অধিকার দিলে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, এই প্রাধান্যটুকুর আত্মতৃপ্তিতে তারা খুশি থাকে। তাতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমে যায় এবং যে কোনও কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

ভক্তমহিলা সুহাসিনী দেবী মাকে একদিন প্রশ্ন করছেন, ''সব শিশুর মনে কি জানার আগ্রহ থাকে? কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখি, কেমন যেন জবুথবু। কিভাবে তাদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগানো যায়? কিভাবে তারা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মতো হবে?" মা হেসে বললেন, ''সে কি গো, তোমরা মা হয়েছ আর কিভাবে ছেলেমেয়েদের মনের খবর জানবে তা তোমাদের বলে দিতে হবে? শোন, ওদের সাথে খুব সহজ সরল ভাবে মিশতে হয়। গল্প করতে হয়। ওদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দিতে হয়। ওদের বেশি বকা-ঝকা করতে নেই, মারতে নেই। ওদের বেশি বকা-ঝকা করলে, মারধর করলে ওরা ভয়ে জবুথবু হয়ে যাবে, দূরে সরে যাবে। ওদের ভালোবেসে বুঝিয়ে দিলে ওরা সহজে বুঝবে। ওদের প্রশ্নকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দিতে নেই। ধমক দিলে বা ভয় দেখালে ওরা কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবে। ওদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাবে।"[১৪]

মা এখানে যা বলেছেন তা চিরকালের শিশু-মনস্তত্ত্ব! শিশুমনোবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি সহজ কথায় মা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মা যেসময় এই কথাগুলি বলেছেন, সেসময় শিশুদের মনের খবর নিয়ে অভিভাবকরা বড়ো একটা মাথা ঘামাতেন না। বড়োদের ইচ্ছে এবং নির্দেশেই ছোটোদের চলতে হত। যদিও তা সবসময় 'ওদের মনের স্বাভাবিক বিকাশের' পক্ষে অনুকূল বলা চলত না।

মা যা বলেছিলেন, আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞান প্রায় একই কথা বলে। Steven R Yussen এবং John W Santrock-এর মতে, ''Facilitation of a child's activity, encouraging activities initiated by children, not using negative non verbal or non physical control of the child can help the children be advanced intellectually."[১৫]

Siraj-Blatchford, Iram এবং Kathy Sylva বলেছেন, ''Direct involvement with children's play and use of open questioning to stimulate their imagination is of great benefit to them."[১৬]

প্রকৃতি তার আপন মাধুর্যে মানুষের মনোজগতে প্রশান্তির গভীর ছায়া বিস্তার করে। আর সেই কারণেই কর্মক্লান্ত, সহস্র জটিলতাময় জীবনের ঘূর্ণাবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির কোলে মনের বিশ্রাম নিতে

মানুষ ছুটে যায় অরণ্যে, সমুদ্রতীরে, মুক্ত আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রান্তরে। বিরাটের সান্নিধ্যে মন ভরে যায় আনন্দে। কবির ভাষায় 'ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি' 'হৃদয় প্রসারিত' হয়।

১৯১২ সালে মা কাশীতে কিরণবাবুদের নতুন বাড়ি 'লক্ষ্মীনিবাসে' আছেন। বাড়িটির প্রশস্ত বারান্দা দেখে মা প্রশংসা করে বলেছিলেন, ''ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।''[১৭]

সরলা দেবী নার্সিং শেখার জন্য 'লেডি ডাফরিন হসপিটালে' ভর্তি হবেন। শুনে গোলাপ মার রাগারাগি, ''সুধীরার এ কি কাণ্ড! ব্রাহ্মণের মেয়েকে হাসপাতালে কাজ করতে দিচ্ছে!... যত অনাসৃষ্টি! ওর হাতে আর কে খাবে?'' কারণ হাসপাতালে 'ছত্রিশ জাতের' সেবা করে হিন্দুঘরের ব্রাহ্মণকন্যা সরলা দেবীকে জাত-ধর্ম সবই খোয়াতে হবে। সব শুনে মা কিন্তু শান্ত, নির্বিকার! বরং ''এই সেবাকাজ শিখতে শ্রীমা যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে আন্তরিক সমর্থন জানালেন।'' বললেন, ''সে কি গোলাপ, শিখে এসে ও আমাদেরই সেবা করবে।''[১৮] শ্রীশ্রীমায়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী যে কত সত্য সেকথা আজ সকলেরই জানা।

সমাজের অর্থহীন কুসংস্কারের বাধা অতিক্রম করে সরলা দেবীর আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেবার কাজ-শিক্ষাকে শ্রীশ্রীমা সানন্দে অনুমোদন করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই অনুমোদন মিলে যাচ্ছে স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে—যে কোনও বিষয় ''বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।''

সর্ববিদ্যাস্বরূপিণী, জ্ঞানদায়িনী সারদা-সরস্বতী সকল বিষয়ে আমাদের জ্ঞান দিতে এসেছিলেন। 'নতুন আদর্শের অগ্রদূত' শ্রীশ্রীমা জ্ঞানের প্রদীপটি জ্বালিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে', তাঁর সেই অগণিত সকল সন্তানের মঙ্গল কামনায়।

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৯৮৬

২। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৪), অখণ্ড, পৃঃ ৩

৩। তদেব, পৃঃ ১১৭

৪। তদেব, পৃঃ ৫০

৫। সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ২৫৫ [এরপর, *শতরূপে সারদা*]

৬। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৩), অখণ্ড, পৃঃ ৩৬০

৭। *শতরূপে সারদা*, পৃঃ ২৫৫-৫৬১

৮। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের* পদপ্রান্তে (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৪), খণ্ড ১, পৃঃ ৯

৯। সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *মাতৃদর্শন* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৭), পৃঃ ৩৮

১০। *শতরূপে সারদা*, পৃঃ ৪১

১১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), পৃঃ ২৮১ [এরপর, *শ্রীমা সারদা দেবী*]

১২। স্বামী ঈশানানন্দ, *মাতৃসান্নিধ্যে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯১), পৃঃ ১৪৩

১৩। তদেব, পৃঃ ১৪৩-৪৪

১৪। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের* পদপ্রান্তে (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৭), খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৮৫

১৫। Steven R Yussen and John W Santrock, *Child Development : An Introduction* (Wm. C Brown Company Publishers : USA, 1978)

১৬। Siraj-Blatchford, Iram, Kathy Sylva, *British Educational Research Journal* (2004), Vol. 30 (5), pp. 713-730

১৭। *শ্রীমা সারদা দেবী*, পৃঃ ২০৯-১০

১৮। সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ১৯৯৫), পৃঃ ৪০